কিছু সফলতার দৃষ্টান্ত

১. সৈয়দপুর ৫০ শয্যা হাসপাতাল থেকে রোগীদের বিনামূল্যে ঔষধ সুবিধা লাভের ক্ষেত্রে সমস্যার অবসান

সৈয়দপুর ৫০ শয্যা হাসপাতালে গরীব রোগীদের বিনামূল্যে ঔষধ প্রদান করা হয় বলে লোকের মুখে ইতিপূর্বে শুনে সেই ভরসায় আলেয়া বেগম ঔষধ কেনার সামর্থ্য নেই এমন এক দরিদ্র রোগীকে চিকিৎসা সেবা লাভের জন্য হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্মরত ব্যক্তি ঔষধ নেই বলে তাদের ফিরিয়ে দেন। সেই দিন তিনি বাধ্য হয়ে শেষ-মেষ বাইরে থেকে চাঁদা তুলে উক্ত রোগীর চিকিৎসার জন্য ঔষধ কিনে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। তিনি গণগবেষণা দলের সাপ্তাহিক সভার আলোচনায় বিষয়টি উত্থাপন করেন।

আলোচনায় উপস্থিত সকলে এই ঘটনা জানার পর এক আলোচক বিষয়টি নিয়ে তথ্য আবেদন করার প্রস্তাব করেন। সরকারীভাবে হাসপাতালে কি কি ঔষধ সরবরাহ করা হয় এবং সেগুলো কিভাবে ব্যবহার করা হয় তা সকলের জানা উচিত বলে সবাই মন্তব্য করেন। গত মাসে সৈয়দপুর ৫০ শয্যা হাসপাতালে কি কি ঔষধ সরকারীভাবে এসেছে এবং সেগুলো কাদের কাদের দেয়া হয়েছে- তা নিয়ে আলেয়া বেগম এর তথ্য আবেদন করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

তারই সূত্র ধরে আলেয়া বেগম গত ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখে এনিমেটর কামরুন নাহার ইরা'র সহায়তায় হাসপাতালের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (ডাক্তার) কাছে আবেদন করেন। আবেদন জমা দিতে গিয়ে সেদিন আলেয়া'র কোন অসুবিধায় পড়তে হয়নি। এর কিছু দিন পর হাসপাতাল থেকে আলেয়া'কে ফোনে ডাকা হয়। সে অনুযায়ী তিনি হাসপাতালে গেলে তারা আলেয়া'কে যথেষ্ট সম্মান করে বসতে দেন এবং ডাক্তার (দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা) নামাজে ব্যস্ত থাকার কারণে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে বলেন। ডাক্তার ফিরে আসলে আলেয়া'র কাছ থেকে তথ্য আবেদনের বিষয়টি নিয়ে জানার চেষ্টা করেন। বিষয়টি তাকে বিস্তারিতভাবে জানানোর পর তিনি আলেয়া'র কথায় খুব খুশী হন এবং আবেদনের সব তথ্য প্রদান করেন। শেষে তিনি আলেয়া'কে আশ্বস্ত করে বলেন, "এর পর থেকে রোগী নিয়ে আসলে হাসপাতালে ঔষধ থাকা সাপেক্ষে আপনার রোগী অবশ্যই সব ধরণের ঔষধ সহায়তা পাবে"।

আবেদনের তথ্য লাভের পর আলেয়া বেগম দলের সাপ্তাহিক আলোচনা সভায় সেগুলো সকলকে জানিয়ে দেন। এর ফলে হাসপাতালে কি কি ঔষধ সরবরাহ করা হয় তা সকলেই জানতে পারেন। হাসপাতাল থেকে গরীব রোগীদের বিনামূল্যে ঔষধ সরবরাহ করার বিষয়টি এলাকার সকলে যাতে জানতে পারে তা সকলকে জানানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

২. পুলিশও তথ্য দিতে ভাধ্য!

"তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯" এর সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে সমাজের পরিবর্তন ঘটানোর লক্ষ্যে গঠিত গণগবেষণা দলের সাপ্তাহিক সভায় থানায় অভিযোগ দায়ের করতে গেলে পুলিশের টাকা নেওয়ার প্রসঙ্গটি গুরুত্বসহকারে আলোচনা করা হয়। তখন অনেকের ধারণা ছিল- থানায় অভিযোগ করতে গেলে কোন টাকা লাগে না। কিন্তু বাস্তবে টাকা না দিলে থানায় কোন অভিযোগ গ্রহণ করা হয় না বলে সেদিন কেউ কেউ আলোচনায় জানানোর পর উল্লেখিত বিষয়ের তথ্য জানার জন্য আবেদন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

গত ১২ জুলাই ২০১১ তারিখে তাহেরা বেগম তাহেরা বেগম,(বাড়ি নং- ১৮, রাস্তা নং- ৫, নতুন বাবু পাড়া, ডাকঘরঃ সোনাখুলী, উপজেলা সৈয়দপুর, জেলাঃ নীলফামারী) তথ্য অধিকার কর্মী কামরুন নাহার ইরা'র সহায়তায় একটি আবেদপত্র লিখে থানায় পাঠিয়ে দেন। তিনি জানুয়ারী ২০১১ হইতে জুন ২০১১ পর্যন্ত কতজন নির্যাতিত নারী থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিল তাদের নামের তালিকার কপি পেতে চান। থানায় গেলে প্রথমে ডিউটি অফিসার আবেদনটি গ্রহণ করতে অপারগতা জানান। কামরুন নাহার ইরা তখনই তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে তাঁদের বুঝিয়ে দেন। আইনটি সর্ম্পকে কিছুটা ধারণা লাভের পর প্রাপ্তি স্বীকারপত্র না দিয়েই অফিসার আবেদনটি গ্রহণ করেন। আর সন্ধ্যার পর স্যার (ওসি) অফিসে আসলে তখন আবেদনের প্রাপ্তি স্বীকার পত্র দেওয়া হবে বলে কামরুন নাহার ইরা'কে আশ্বাস দেয়া হয়। ডিউটি অফিসারের কথা অনুযায়ী সেদিন সন্ধ্যায় কামরুন নাহার ইরা আবারো থানায় গেলে তখন আবেদনটি আর পাওয়া যাচ্ছে না বলে তাঁকে জানানো হয়। তাই বাধ্য হয়ে তিনি রেজিস্ট্রি ডাকযোগে গত ৩০ জুলাই ২০১১ তারিখে আবেদনটি থানায় পাঠিয়ে দেন। আইন অনুযায়ী নির্ধারিত ২০ কার্যদিবস অতিক্রান্ত হওয়ার পরও কোন জবাব না পাওয়ার কারণে গত ৩ অক্টোবর ২০১১ তারিখে তাহেরা বেগম রেজিস্টার ডাকযোগে জেলা পুলিশ সুপারের কাছে আপীল করেন। সেখান থেকেও কোন জবাব না আসায় গত ২৫ অক্টোবর ২০১১ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ পাঠিয়ে দেন।

তাহেরা বেগম এর অভিযোগের প্রেক্ষিতে গত ৯ জানুয়ারী ২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। কমিশন শুনানিতে উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনে সৈয়দপুর থানার দারোগা ও অভিযুক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ জামাল উদ্দিনকে তথ্য প্রদানের নির্দেশ দেন। এলাকায় তাহেরা বেগম এর এই তথ্য আবেদনের বিষয়টি জানাজানি হলে তা নিয়ে প্রথম আলো পত্রিকায় একটি প্রতিবেদন (৯/১/২০১২) প্রকাশিত হয়। তথ্য কমিশনে অনুষ্ঠিত শুনানি অনুষ্ঠানটি এটিএন বাংলা সহ বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক্স ও প্রিন্ট মিডিয়ার প্রকাশিত হয়।

এই তথ্য আবেদনের ফলে জনগণের সামনে এটা এখন পরিস্কার হয়ে উঠছে যে, এদেশের জনগণের কাছে থানা পুলিশ সাধারণত একটা ভয়ের জায়গা হওয়ার কারণে সেখানে গৃহিনীরা/নারীরা তো বটেই, সাধারণ জনগণও সাধারণত যেতে চান না। বলতে গেলে খুব একটা প্রয়োজন দেখা না দিলে সেখানে কেউই যান না। এই আবেদন এখন জনগণের মনে সাহস যোগাচ্ছে। জনগণকে নানান অফিসে তথ্য আবেদন করতে উৎসাহ দিচ্ছে। কারণ জনগণ এখন বুঝতে পারছেন যে, তথ্য অধিকার আইন এমন একটা শক্তিশালী আইন, যা তাহেরা বেগম এর মত একজন সাধারণ গৃহিনীকে থানা পুলিশের কাছ থেকেও প্রয়োজনীয় তথ্য লাভের সুযোগ এনে দিয়েছে। তাই জনগণ মনে করছেন, থানা পুলিশকে যদি এভাবে তথ্য প্রদান করতে বাধ্য হয় তাহলে অন্যদেরও অতি সহজেই তথ্য প্রদানে বাধ্য করা সম্ভব। তথ্য জানার মাধ্যমে সরকারী ও বেসরকারী সব প্রতিষ্ঠানের কাজের নজরদারি করা সম্ভব। তাহেরা বেগম ও কামরুন নাহার ইরা'দের এভাবে ঢাকায় এসে শুনানিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তথ্য লাভের ঘটনা দেশে নারীর ক্ষমতায়নের কথা সকলকে স্মরণ করে দেয়।

৩. খাগড়াছড়িতে তথ্য লাভের মাধ্যমে বাজারের টোল আদায় কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও অনিয়ম রোধে সফলতা অর্জন

মিলন খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার খবং পড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা। বাজার করতে গিয়ে মাঝে মধ্যেই বিক্রেতাদের কাছে টোল সংগ্রহে অনিয়মের বিষয়ে নানা কথা শুনতে পান। প্রায় সকল বিক্রেতার মধ্যেই এই টোল আদায় নিয়ে অসন্তোষ রয়েছে কিন্তু তারা কেউই কিছু বলতে পারেন না। আসলে তারা জানেন না যে কোথায় কি বলতে হবে বা কাকে কি বলতে হবে। তিনি মনে করেন যে বিষয়য়টির সাথে দুর্নীতি যেমন জড়িত তেমনি জনগণের নাগরিক অধিকার লংঘনের বিষয়ও রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে বাজারে বিভিন্ন জিনিসপত্র ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে যে টোল আদায়ে অনিয়ম হয় তা প্রতিরোধের জন্য গত ১৬ অক্টোবর ২০১১ তারিখে গণগবেষণা দলের সদস্য মিলন চাকমা বাজার ফান্ড কার্যালয়ে সংশ্লিষ্ট তথ্য পাওয়ার জন্য আবেদন করেন। আবেদনের বিষয় ছিল- বাজারে বিভিন্ন জিনিসপত্র ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কোন জিনিসের উপর কি ধরণের টোল আদায়ের পরিমাণ ধার্য্য করা আছে তার নিয়মাবলী জানা। আইনে নির্ধারিত ২০ কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কোন জবাব না দিলে পরে পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি এর চেয়ারম্যান বরাবরে আপীল করা হয়। এরপর চেয়ারম্যান তথ্য প্রদানের নির্দেশ দিলে উক্ত কর্মকর্তা তথ্য প্রদান করতে বাধ্য হন।

আবেদনের তথ্য লাভের পর সেটা নিয়ে গণগবেষণা দলের সভায় বিস্তারিত খতিয়ে দেখা হয়। তাতে সংশ্লিষ্টদের অনিয়মের বিষয়টি ধ'রা পড়ে। তাই এই বিষয়ে এলাকার জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে তারা প্রাপ্ত তথ্যটি প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তারই অংশ হিসেবে খাগড়াছড়ি শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলোতে উক্ত তথ্যের ফটোকপি টাঙিয়ে দিয়েছেন। এর ধারাবাহিকতায় গত ০২ ফেব্রুয়ারী ২০১২ তারিখ বৃহস্পতিবার এনিমেটর রিপন চাকমা গণগবেষণা দলের অপর সদস্য বিদর্শন চাকমা-কে সাথে নিয়ে হলুদ এবং চাউলের বাজার পরিদর্শনে যান।

এই সময় তারা টোল আদায়কারীকে দর কষাকষি করতে স্বচক্ষে দেখতে পান। নিজের হলুদ বিক্রির পর লোকটি তাদেরকে জানান, "আমার কাছ থেকে ৫০ টাকা চাঁদা (টোল) চায়"। লোকটির হলুদের ওজন হয়েছিল ১ মন ১৯ কেজি। তাই হিসাব মোতাবেক তাকে ২২ টাকা চাঁদা (টোল) দিতে হয়। তখন রিপন চাকমা কিভাবে টাকা দিতে হবে তা টোল আদায়কারীর কাছে জিজ্ঞেস করেন। টোল আদায়কারী পাঁকা হলুদ ও কাঁচা হলুদের মধ্যে জট পাকিয়ে তাদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেন। তখন রিপন তাকে তালিকাটি দেখিয়ে বলে, "ভাই, তাকে তো হিসেব মোতাবেক ২২ টাকা দিতে হয়। আপনি কেন ৫০ টাকা চাচ্ছেন?" টোল আদায়কারী তালিকাটি পেয়ে অবাক হয় এবং হিসাবে ভুল হয়েছে বলে দুঃখ প্রকাশ করে ২০ টাকা নিয়ে চলে যান। এ সময় রিপন ও বিদর্শন বিক্রেতাদের মধ্যে টোল আদায়ের নিয়মাবলীর তালিকাটি আরো বেশি করে বিতরণ করেন এবং কোনভাবেই যাতে টোল আদায়কারীকে বেশি টাকা না দেয় সেই বিষয়ে সচেতন করেন। বিক্রেতারা তাদের প্রতিক্রিয়ায় জানান "ভাই, খুব ভাল হয়েছে। তালিকাটি দিয়ে আজকে আমরা ২ মণ হলুদ ৩০ টাকা দিয়ে রেহাই পেয়েছি। এই ব্যাপারটি আমরা এলাকায় গিয়ে জানাবো এবং তালিকাটির ফটোকপি সবাইকে ভাগ করে দেবো"। এরপর চাউলের বাজারে মনিটরিং করতে গেলে সেখানেও অতিরিক্ত টোল আদায় করার অনিয়ম ধরা পড়ে। যেখানে ৫ টাকা দেওয়ার নিয়ম সেখানে ১০ টাকা নেওয়ার বিষয়টি তারা প্রত্যক্ষ করেন। তাদের মাঝেও রিপন ও বিদর্শন

তালিকার কপি প্রদান করেন এবং কিছু লিখিত রশিদ সংগ্রহ করেন। পুরো ব্যাপারটি নিয়ে তারা এক পর্যায়ে বাজার ফান্ড কার্যালয়ে গিয়ে অনিয়মের কথা জানিয়ে দেন। তখন সেখান থেকে তাদের সাধারণ লোকজনের কাছ থেকে অভিযোগ না আসলে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব নয় বলে তাদের জানিয়ে দেয়া হয়। তাই সাধারণ মানুষ হিসেবে এই অনিয়মের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বাজার ফান্ড কার্যালয়ে অভিযোগ দাখিল করেন।

তথ্যটি এভাবে জনসমক্ষে প্রচারের ফলে বাজার ফান্ড কর্তৃপক্ষের টোল আদায়ের অনিয়মের বিষয়টি এলাকার সকলে জানতে শুরু করেছেন। এতে সংশ্লিষ্ট সকলেই সতর্ক হয়েছেন। অনেক বিক্রেতা অতিরিক্ত টোল প্রদান থেকে রেহায় পাচ্ছেন। উল্লেখ্য যে, প্রাপ্ত তথ্যটি অত্যন্ত জনগুরুত্বপূর্ণ একটি তথ্য। কারণ বাজারে যারা উৎপাদিত দ্রব্যাদি বিক্রি করে থাকেন তারা সাধারণত সকলেই দরিদ্র শ্রেণীর। এই তথ্য জানার ফলে তারা টোল আদায়ের নামে কর্তৃপক্ষের অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের ভোগান্তি থেকে রক্ষা পাচ্ছেন। আশা করা যায়, এতে যদি ভবিষ্যতে জনগণ আরো বেশি সোচ্ছার হয়ে উঠেন তাহলে টোল আদায়ের নামে বাজার ফান্ডের দীর্ঘদিনের অনিয়ম চিরতরে বন্ধ হবে। এই সকল কারণে তথ্য আবেদনের এই কাজটি এলাকায় খুবই প্রশংসিত হয়েছে বলে জানা গেছে। গণগবেষণা সভায় বিষয়টি নিয়ে বাজারে মাইকিং করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

৪. কৃষি ভর্তুকি প্রদানের ক্ষেত্রে দুর্নীতি হ্রাস

মো. সউদ খান (ছদ্মনাম) একজন বেদে সম্প্রদায়ের সদস্য এবং কৃষক। দীর্ঘদিন ধরে তিনি পদ্মার চরে চাষাবাদ করেন। অভাবের কারনে বীজ, চারা, কীটনাশক ইত্যাদি যোগাড় করতে তাকে হিমসিম খেতে হয়। আর কোনোমতে যদি এসবের ব্যবস্থা করতে পারেন তাহলে আর এক বিপদ এসে দেখা দেয় যার নাম প্রকৃতিক দুর্যোগ। প্রায় প্রতি বছরই ফসল উৎপাদনে এমন সমস্যায় পরতে হয়। এর প্রতিকারের আশায় মেম্বার-চেয়ারম্যান-ব্লক সুপারভাইজারদের কাছে গেলে তারা অশ্বাস দেয় যে বরাদ্দ আসলে তা দেওয়া হবে। অনেক সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থদের নামের তালিকা ও ঠিকানা নিয়ে যাওয়া হয়। তাই আর সবার মতো সউদ খানও আশায় থাকে এই বুঝি সরকারী বরাদ্দ আসে আর সেখান থেকে কিছু সাহায্য পাওয়া যায়। কিন্তু সাহয্য পাওয়া তো দূরের কথা প্রতিবার ঐ নাম-ঠিকানা নেওয়ার পরে আর কোনো সাড়াশব্দ থাকে না। হতাশ হয়ে তিনি সিদ্ধান্ড় নেন যে সে আর কখনো নাম তালিকাভুক্ত করবেন না। ২০১০ সালে সে একটি বেসরকারী সাহায্য সংস্থার মাধ্যমে দরিদ্র কৃষকদের জন্য সরকারী কৃষিকার্ড এর কথা জানতে পারেন। এলাকার অনেকে এখানে নাম তালিকাভুক্ত করতে পারলেও বেদে হওয়ার কারনে প্রথমে সে বাদ পড়ে। পরবর্তীতে একদিন তিনি কৃষিকার্ড প্রাপ্তদের নামের তালিকা ও নিয়মাবলীর কপি চেয়ে তথ্য আবেদন করেন। এরপরে সেখান থেকে তাকে ডেকে কিভাবে নাম অন্ড়র্ভুক্ত করতে হয় তার নিয়মাবলী শিখিয়ে দেওয়া হয় এবং তালিকায় তার নাম অন্ড়র্ভুক্ত করা হয়। এর কিছদির পরে সউদ খান খোজ নিয়ে দেখেন যে তার নামে ৮০০ টাকা ভর্তুকি বরাদ্দ করা হয়েছে এবং সাথে সাথেই তাকে সেই টাকা প্রদান করা হয়। তথ্য অধিকার অইনের ক্ষমতা দেখে তিনি অবাক হয়ে যান।

৫. তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে রবিদাস সম্প্রদায়ের বয়স্কভাতা প্রাপ্তি

১৯৯৭ সালে সরকার বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম শুরু করে সরকারী সেবামূলক কর্মসূচীর অধীনে যাতে দরিদ্র শ্রেণীর বয়স্ক ব্যক্তিদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

এই প্রকল্পের আওতায় ৬২ এবং তদুর্ধ্ব বয়সী দরিদ্র ব্যক্তিদের মাসে ৩০০ টাকা করে ভাতা প্রদান করা হয়। নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর উপজেলার রবিদাস সম্প্রদায়ের বয়স্ক ব্যক্তিরা এই সেবা হতে পুরাপুরি বঞ্চিত ছিলেন। স্থানীয় কতৃকক্ষের সাথে যতবারই এ বিষয়ে কথা বলা হয়েছে ততবারই শুধু আশ্বাস ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় নি। মুন্না দাস যিনি রবিদাস সম্প্রদায়ের একজন সদস্য ও রিইব প্রশিক্ষিত তথ্যকর্মী তিনি তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে কারা বয়স্ক ভাতা পায়, এ সুবিধা পাওয়ার শর্ত কি, কারা এ ব্যপারে সিদ্ধান্ত নেন এসব বিষয়ে জানতে আগ্রহী হন।

মুন্না দাস সৈয়দপুর উপজেলার সমাজসেবা কর্মকর্তার কাছে তার এলাকার বয়স্কভাতাপ্রাপ্তদের নামের তালিকা এবং বয়স্ক ভাতা পাওয়ার নিযমাবলীর কপি পেতে চান। আবেদনপত্র জমা দেয়ার পরে তিনি সৈয়দপুর উপজেলার সমাজসেবা কর্মকর্তার অফিসে যান। সমাজসেবা কর্মকর্তা বলেন তিনি তালিকা প্রদান করতে পারবেন না কিন্তু মুন্না দাস যদি কোন ছবিসহ তালিকা দেন যারা বয়স্ক ভাতা পেতে পারেন তাহলে তাদের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সে অনুযায়ী মুন্না ৫ জনের তালিকা প্রদান করেন যাদেরকে পরবর্তীতে বয়স্ক ভাতা কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এরপরে তারা প্রত্যেকে ৩৬০০ করে টাকা পান। খুব সাধারন ও সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণীর জনগণ যারা নিজেদের অধিকার থেকে বঞ্চিত তাদের অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন একটি শক্তিশালী হাতিয়ার।

৬. তথ্য আবেদনের মাধ্যমে প্রশিকার সাবেক কর্মী শিক্ষক দয়াময় চাকমা'র প্রভিডেন্ট ফান্ড ও গ্রাচুইটি খাতে সঞ্চিত অর্থ লাভ।

দয়াময় চাকমা ৮ বছর চাকুরী করার পর প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র থেকে বিধি মোতাবেক পদত্যাগ করেন ২০০৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে। চাকুরীকালীণ সময়ে বেতন থেকে বেসিক ১০% কেটে রাখত এছাড়াও প্রভিডেন্ট ফান্ড ও গ্রাচুইটি মিলে প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র থেকে তার সর্বমোট পাওনার পরিমাণ ১,৫০,৩২৭/- (এক লক্ষ পঁঞ্চাশ হাজার তিনশত সাতাশ টাকা)। উক্ত পাওনা টাকা প্রধান কার্যালয় কর্তৃক পদত্যাগপত্র গ্রহণের পরবর্তী ৩ মাসের মধ্যে পরিশোধ করার কথা জানানো হয়েছিল। উক্ত সময়ে যোগাযোগ করলে তাকে জানানো হয়েছিল যে, নির্ধারিত তারিখে টাকাগুলো প্রদান করা যাচ্ছে না। কখন দেওয়া হবে তা পরবর্তীতে জানানো হবে। তারপরও হাল ছেড়ে না দিয়ে অনেক যোগাযোগ করে দয়াময় প্রথম কিস্ড়ি হিসেবে মাত্র ২৫,০০/- (পঁচিশ হাজার টাকা) লাভে সমর্থ হয়। পরবর্তীতে অবশিষ্ট টাকাগুলো কখন বা কত তারিখে দেওয়া হবে তার কিছুই প্রশিকা'র হেড অফিস থেকে জানানো হয়নি। তাই হতাশ হয়ে সে ধরেই নিয়েছিলো যে অবশিষ্ট পাওনা টাকাগুলো হয়তো আর কখনো পাওয়া যাবে না।

এরইমধ্যে ৫ টি বছর অতিক্রান্ড় হয়ে যায়। ২০১২ সালের শুর“তে দয়াময় এক বন্ধুর মাধ্যমে জানতে পারে প্রশিকার অপর একজন প্রাক্তন কর্মী তথ্য অধিকার আইন (২০০৯) ব্যবহারের মাধ্যমে তার সম্পূর্ণ পাওনা লাভে সমর্থ হয়েছেন। কিছুটা অশাবাদী হয়ে তিনি তথ্য অধিকার কর্মী রিপন চাকমার সহায়তায় তথ্য অধিকার আইনের নির্ধারিত ফরমে প্রশিকা হেড অফিসে আবেদনের চিঠি পাঠান। প্রশিকা কর্মীদের প্রভিডেন্ট ফান্ড পরিচালনার নীতিমালা এবং যে সিদ্ধান্ড়ের ভিত্তিতে প্রশিকার সাবেক কর্মী দয়াময় চাকমা'র প্রভিডেন্ট ও গ্রাচুইটি খাতে সঞ্চিত অর্থ প্রদান স্থগিত রাখা হয়েছে সেই সিদ্ধান্ড়বলী এবং সিদ্ধান্ড়গ্রহণকারীদের পদবী সহ নামের তালিকার কপি পাওয়ার জন্য আবেদন করা হয়।

আইনে নির্ধারিত ২০ কার্যদিবসের মধ্যে প্রশিকা কর্তৃপক্ষ চাহিদা মোতাবেক তথ্য প্রেরণ করে। কিন্তু তথ্য অসম্পূর্ণ থাকায় দ্বিতীয় দফায় আইন অনুযায়ী আপীল করেন দয়াময় চাকমা। প্রশিকা কর্তৃপক্ষ আপীল পাওয়ার পর তার সাথে যোগাযোগ করে এবং অবশিষ্ট পাওনা বাবদ ১,২৫,৩২৭/- (এক লক্ষ পঁচিশ হাজার তিনশত সাতাশ টাকা) টাকা বুঝে নেওয়ার জন্য ঢাকায় আসতে অনুরোধ করে। সে অনুযায়ী ঢাকায় এসে চেক এর মাধ্যমে তার সমুদয় পাওনা টাকা গ্রহণ করেন দয়াময়। যে টাকা পাওয়ার আসা একরকম ছেড়েই দিয়েছিলো তা দুটি আবেদনের মাধ্যমে ফিরে পেয়ে সে অভিভূত হয়ে যান এবং ভাবে এমন আইন ও কি সম্ভব যার মাধ্যমে কতৃপক্ষের দুর্নীতি তো ধরা পরবেই আর সাথে সাথে জনগণও তার প্রাপ্য অধিকার আদায় করতে পারে।

৭. একটি তথ্য আবেদন; অত:পর জিয়া হল ক্যান্টিন চালুর মাধ্যমে ছাত্রদের দুর্বিষহ ভোগান্তির অবসান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জিয়া হল ক্যান্টিন প্রায় তিন মাস যাবত বন্ধ থাকায় ছাত্রদের খাবার সমস্যার বিষয়টি ভয়াবহ আকার ধারণ করে। এ কারণে অনেক ছাত্র হল ছেড়ে মেস ও সাবলেটে উঠতে বাধ্য হন। হল কর্তৃপক্ষের অবহেলা আর ছাএলীগের অনিয়মের কারণে ক্যান্টিন বন্ধ হয়ে যায় বলে জানা যায় যার ফল ভোগ করতে হয় হলের সাধারন ছাত্রদের। সাধারন ছাত্ররা এই অনিয়মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে পারেননি। কারণ এর ফলে তাদের হল ছাড়তে হতে পারে, নয়তো কর্তৃপক্ষের কিংবা ছাএলীগের রোষানলে পড়তে হতে পারে। গত জুলাই (২০১২) মাসে গণগবেষণা দলের সভায় জিয়া হল ক্যান্টিনের এই সমস্যাটি গুরুত্বের সাথে আলোচনা করা হয়। তাতে সকলে মিলে তথ্য আবেদন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২৬ জুলাই ২০১২ তারিখে "তথ্য অধিকার আইন ২০০৯" এর ৮(১) ধারার ভিত্তিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবর জিয়া হল ক্যান্টিন যে সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বন্ধ করা হয়েছে এবং কবে নাগাদ আবার চালু করা হবে তার সুনির্দিষ্ট তারিখ জানতে চেয়ে আবেদন করা হয়। আইন অনুযায়ী ২০ কার্যদিবস এর মধ্যে আবেদনের জবাব/উত্তর দিতে বাধ্য থাকলেও ১০ কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনকারী মো: শামীন হোসেন'কে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ফোন করেন এবং তাকে অফিসে দেখা করতে অনুরোধ করেন। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছুটি থাকায় এবং শামীন গ্রামের বাড়িতে অবস্থান করার কারনে ফোনে বিস্তারিত আলাপ হয় এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হল ক্যান্টিন বন্ধ রাখার ব্যাপারে লিখিত কোন সিদ্ধান্ত নেই বলে শামীনকে জানান। এজন্যে তিনি শামীন এর কাছে দুঃখ প্রকাশ করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় খোলার দিন থেকে হল ক্যান্টিন চালু করা হবে বলে আশ্বস্ত করে বলেন। অত:পর বিশ্ববিদ্যালয় খোলার দিন অর্থাৎ গত ২৮-০৮-২০১২ তারিখে গণগবেষণা দলের কয়েক জন সদস্যকে নিয়ে শামীন জিয়া হল ক্যান্টিন পরিদর্শনে যান। তখন ক্যান্টিন চালু করার ঘটনা

স্বচক্ষে দেখতে পান আর খাবারের মান যাচাই করতে সেদিন নিজেরাও দুপুরের খাবার খান এবং কয়েকজন ছাত্রের সাথে কথা বলেন। তারা বুঝতে পারেন, খাবারের মান আগের থেকে অনেক ভাল। তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং তথ্য কর্মী হিসেবে শামীন নিজে খুব গর্ববোধ করার কথা জানান। তিনি আরো বলেন, এই ঘটনা প্রমাণ করল তথ্য অধিকার আইন তথ্য পাওয়ার একটি কার্যকর মাধ্যম এবং নাগরিকের প্রতিবাদের একটি শক্ত হাতিয়ার।

৮. তথ্য অধিকার কর্মীদের কর্মতৎপরতার পরিপ্রেক্ষিতে খাগড়াছড়িতে জনৈক প্রধান শিক্ষক কর্তৃক ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে নিয়মবহির্ভূতভাবে অর্থ আদায়ের ঘটনার অবসান

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় কিছু কিছু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে নিয়মবহির্ভূতভাবে শিক্ষকদের কর্তৃক অর্থ আদায়ের ঘটনা প্রায়ই শোনা যায়। বিষয়টি স্থানীয় তথ্য অধিকার কর্মীদের আমলে এলে এ ব্যাপারে কি করা উচিত তা নিয়ে তারা আলোচনা করেন। তখন এই অনিয়মের বিষয়টি উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের দৃষ্টিগোচর করা দরকার বলে তারা মত প্রকাশ করেন। তারপর একদিন উপজেলা শিক্ষা অফিসে তথ্য আবেদন জমা দিতে গেলে এই ধরণের অনিয়মের বিষয় নিয়ে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের লোকজনের সাথে তথ্য অধিকার কর্মীদের (রিপন, মিলন) আলোচনা হয়। তখন শিক্ষা অফিসের লোকজন বিষয়টি দেখবেন বলে তাদের আশ্বস্ত করেন।

গত ২৫/০১/২০১২ তারিখে ট্রান্সপারেন্সী ইন্টারন্যাশন্যাল বাংলাদেশ (টিআইবি) এক নেটওর্য়াকিং সভার আয়োজন করে। সেই সভায় উপজেলা শিক্ষা অফিস, আলো, জাবারাং মহিলা কল্যাণ সমিতি, তৃণমূল, ব্র্যাক, আনন্দ ও পাড়া- ট্রাস্ট সহ প্রভৃতি সংস্থা অংশগ্রহণ করে। সভায় তথ্য অধিকার আইন ও এর ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করা হয়। আলোচনার এক পর্যায়ে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার (খাগড়াছড়ি সদর) জানান, তিনি তার অধীনস্থ এক প্রধান শিক্ষককে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে নিয়মবহির্ভূতভাবে আদায় করা ফি ২৪ ঘন্টার মধ্যে ফেরত দিতে বলেন। এক পর্যায়ে প্রধান শিক্ষকও ছাত্র-ছাত্রীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ফি বাবদ অতিরিক্ত নেওয়া অর্থ (সমাপনী পরীক্ষার সার্টিফিকেট প্রদানের সময় প্রতি ছাত্র-ছাত্রীর কাছ থেকে ৩০০ টাকা হারে নেওয়া হয়) ফেরত দিতে রাজি হন। তিনি আরো জানান, তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহার এখন যেভাবে শুরু হয়েছে তাতে যে কোন সময় এই অনিয়মের বিষয়টি নিয়ে তথ্য আবেদন হতে পারে। তখন এই অনিয়মের বিষয়টি ধরা পড়লে নিজের এবং প্রধান শিক্ষকের মান সম্মান নিয়ে টানাটানি হতে পারে বলে তিনি মনে করেন। তাই সে ধরণের পরিস্থিতি এড়াতে তিনি এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন বলে জানান। তিনি মনে করেন, তথ্য আবেদন করার কারণে এখন সবার মধ্যে সচেতনতা তৈরী হতে শুরু করেছে। এখন সবাই সজাগ হচ্ছে। যার ফল দীর্ঘদিন ধরে বলবৎ থাকবে বলে আশা করা যায়। এতে প্রতীয়মান হয় যে, তথ্য আবেদন করার কারণে সরকারী অফিসে পরিবর্তন আসতে শুরু করেছে। সরকারী কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। উল্লেখ্য যে, তথ্য অধিকার কর্মীরা মাঠ পর্যায়ে খোঁজ নিয়ে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের বক্তব্যের সত্যতা খুঁজে পেয়েছেন।

৯. খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতালে চিকিৎসা সেবা প্রদানে অনিয়ম ও রোগীদের নানা ভোগান্তিজনিত সমস্যার সমাধান

খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতালে রোগীদের চিকিৎসা সেবা প্রদানে অনিয়মের কথা দীর্ঘদিন ধরে শোনা যাচ্ছিল। দেশের একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে আরটিআই প্রকল্প, রিইব ও পাড়া ট্রাস্ট, খাগড়াছড়ির গণগবেষণা দলের সদস্য মিলন চাকমা বিষয়টি নিয়ে তিনি প্রায়ই ভাবতেন বলে জানান। আরটিআই প্রকল্পের একজন সদস্য হিসেবে একদিন দলীয় আলোচনায় বিষয়টি নিয়ে আবেদন করার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়। সে অনুযায়ী মিলন চাকমা গত ২৭ জুন ২০১১ তারিখে উল্লেখিত কর্তৃপক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আরএমও'র কাছে তথ্য আবেদন করেন। তাঁর আবেদনের বিষয় ছিলঃ

১। বর্তমানে হাসপাতালে কি কি ঔষধ বিনামূল্যে দেওয়া হয় তার তালিকা এবং

২। এম.আর, ডেলিভারীর বিনিময়ে কোন মূল্য পরিশোধ করতে হয় কিনা তার নির্দেশনা থাকলে সেই নির্দেশনার কপি পেতে চান

মিলন চাকমা'র আবেদন জমা দেওয়ার কিছুদিন পর, হাসপাতালের আরএমও তাঁর সাথে দেখা করতে যাওয়ার জন্য অনুরোধ জানান। সে অনুযায়ী পরের দিন মিলন চাকমা'র সাথে দলীয় এনিমেটর রিপন চাকমাও আরএমওর সাথে দেখা করতে যান। আইনটি সর্ম্পকে সুস্পষ্ঠ ধারণা না থাকার কারণে আবেদনটি পেয়ে আরএমও প্রথমে ভেবেছিলেন যে, সেবা নিতে গিয়ে কোন ডাক্তারের সাথে মিলন চাকমা'র ভুল বোঝাবুঝি হওয়ার কারণে আবেদনটি করা হয়েছে। তাই সাক্ষাতের প্রথমেই তিনি মিলন চাকমা'র কাছে কোন ধরণের ভুল বুঝাবুঝি হয়েছে কিনা তা জেনে নেন। আলোচনার এক পর্যায়ে মিলন চাকমা আরএমওকে তাঁর আবেদনের বিষয়টি বিস্তারিত অবগত করেন। ব্যাপারটি বুঝতে পেরে আরএমও খুব খুশি হন এবং এই তথ্যগুলো গরীব জনগণের খুব উপকারে আসবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। এর পরবর্তীতে কিছুদিনের মধ্যে আরএমও মিলন চাকমা'কে সব তথ্য প্রদান করেন।

প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনা করে মিলন চাকমা'রা অনেকটা হতবাক হয়ে যান, যখন দেখতে পান যে, সরকারীভাবে বর্তমানে হাসপাতালে ৭৭ ধরণের ঔষধ বিনামূল্যে সরবরাহ করা হচ্ছে। যদিও হাসপাতালে আসা রোগীদের এসকল ঔষধ সাধারণত দেয়া হয় না। হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা রোগীদের প্রায় সময়েই বাইরের ফার্ম্মেসী থেকে এ সকল ঔষধ কিনতে হতো বলে অভিযোগ শোনা যায়। অন্যদিকে হাসপাতালে বিনামূল্যে এম.আর এবং ডেলিভারি সুবিধা প্রদানের বিষয়টিও মিলন চাকমা'রা জানতে পারেন। তাই তাঁরা নিজেদের আলোচনা সভায় উল্লেখিত তথ্য জনগণের কাছে প্রচারের সিদ্ধান্ত নেন এবং সে অনুযায়ী প্রাপ্ত তথ্যগুলো ফটোকপি করে এলাকার জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করেন, যেটার উদ্দেশ্য হচ্ছে হাসপাতালে সরকারীভাবে রোগীদের বিনামূল্যে প্রদত্ত ঔষধ ও

সেবা সর্ম্পকে সবাইকে সচেতন করে তোলা। হাসপাতালে বিনামূল্যে প্রদত্ত সেবা গ্রহণে এবং প্রদানে সংশ্লিষ্টদের আগ্রহী করে তোলা। এ লক্ষ্যে এলাকার নানা ক্লাবে গিয়ে জনগণের সাথে মিটিং করা হচ্ছে। এ সকল তথ্য লাভের বিষয়টি প্রচারের মাধ্যমে জনগণকে তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহারে আগ্রহী করে তোলার প্রয়াস চালানো হচ্ছে।

তথ্য আবেদনের প্রেক্ষিতে উল্লেখিত কার্যক্রম পরিচালনার ফলে এখন হাসপাতালে বিনামূল্যে ঔষধগুলো বিতরণ করা হচ্ছে। আর ডেলিভরীর জন্য কোন টাকা নেওয়া হচ্ছে না। আগে এই দু'টো বিষয়ে অনিয়ম থাকলেও বর্তমানে সেগুলো অনেকটা কমে গেছে বলে সংশ্লিষ্টদের বয়ানে জানা যায়। এপ্রেক্ষিতে হাসপাতালে চিকিৎসা সেবা নিতে আসা রোগী জ্যাকশন চাকমা'র পিতা লক্ষীবাহন চাকমা জানান, "এক সময় হাসপাতালে তেমন কোন ঔষধ পাওয়া যেত না, কিন্তু এখন প্রয়োজনীয় অনেক ঔষধ পাওয়া যাচ্ছে। এটা আমাদের মত গরীব লোকদের জন্য খুবই উপকারে লাগছে"। এনিমেটর রিপন চাকমা জানান, "তথ্য চাওয়ার ফলে একদিকে যেমন ডাক্তারের সাথে ভালো সর্ম্পক তৈরী হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি গরীব মানুষকেও সহযোগিতা প্রদানে সুবিধা হচ্ছে"।

১০. তথ্য আবেদনের পর বাড়ীতে জবাব প্রেরণ

গরু-ছাগলের চিকিৎসার জন্য সরকারি পশু পালন কর্মকর্তারা কোন প্রকার ফি এবং ওষধের দাম নিতে পারেন কিনা ? গত ২০১০-২০১২ অর্থবছরে সৈয়দপুর উপজেলায় মোট কতটি গরু -ছাগলকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে ? উক্ত সেবা প্রদানের বিপরীতে সরকারিভাবে কত টাকা আয় ও ব্যয় হয়েছে? এবং একই অর্থবছরসমূহে (২০১০-২০১২) সৈয়দপুর উপজেলায় পশু চিকিৎসা বাবদ বিনামূল্যে বিতরনের জন্য কি কি ঔষধ বরাদ্দ এসেছে তার তালিকার কপি পাওয়ার জন্য রাজু দাস নামে স্থানীয় রবিদাস সম্প্রদায়ের এক মুচি গত ২৬ জুলাই ২০১২ তারিখে আবেদন করেন। আবেদনটি রেজিষ্টার ডাকযোগে উপজেলা প্রাণী সর্ম্পদ কর্মকর্তার অফিসে পাঠানো হয়। আবেদন পাঠানোর ১৮ দিন পর উক্ত অফিসের একজন বাড়ীর সামনের দোকানে মুন্না ও রাজুদাস'কে চিনেন কিনা তা জিজ্ঞেস করেন। তখন দোকানদার কি হয়েছে তা জানতে চাইলে উক্ত কর্মকর্তা তথ্য জানতে চেয়ে তাদের আবেদন করার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। তখন দোকানদার মুন্না দাস'কে ডেকে দেন। মুন্না দাস আসলে তিনি উপজেলা প্রাণী সম্পদ কার্যালয় হতে তার আগমনের কথা জানান এবং তথ্য প্রদানের বিপরীতে তাকে মূল্য পরিশোধ করার কথা জানিয়ে দেন। তখন মুন্না দাস বলেন, আপনি তো মোবাইলে এই বিষয়টি জানাতে পারতেন। এর জবাবে উক্ত কর্মকর্তা মোবাইল করার জন্য সরকার তাদের কোন বিল দেয়না বলে জানান। আলোচনার এক পর্যায়ে তিনি বলেন, আপনাদের তথ্য আবেদনের জবাব নিয়ে এসেছি স্বাক্ষর করে নেন। এরপর রাজু দাস'কেও তথ্য গ্রহণের জন্য ডাকতে বলেন। তখন রাজু দাস'কে স্কুল থেকে ডেকে এনে আবেদনের জবাব প্রদান করা হয়। তখন উপস্থিত সকলের মাঝে উক্ত কর্মকতা বলেন আমাদের অনেক কাজ ছেড়ে আপনাদের বাড়ী আসতে হয়েছে। এখন এলাকার লোকজন ভালভাবে বুঝতে পারছে যে, এক সময় সরকারি অফিসে রবিদাসদের ঢুকতে দেয়া না হলেও এখন বাড়িতে এসে তারা আবেদনের তথ্য দিতে বাধ্য হচ্ছে।

১১. ভূমিহীনদের খাসজমি লাভের ক্ষেত্রে সমস্যার সুরাহা

নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর উপজেলায় বসবাসরত রবিদাস সম্প্রদায়ের মধ্যে বর্তমানে অনেক ভূমিহীন পরিবার রয়েছে। অন্য অনেকের মত তাঁদের দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন- সরকারী খাস জমির বন্দোবস্ত পাওয়া। অথচ এখনো পর্যন্ত তাঁদের কারোর কপালে সেই সৌভাগ্য জোটেনি। তাই সংশ্লিষ্ট বিষয়ের তথ্য জানার জন্য রিইবের গণগবেষণা দলের সদস্য মিঠুন দাস এলাকার সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিসে আবেদন করেন। তাঁর আবেদনের বিষয় ছিল- ৫নং খাতামধুপুর ইউনিয়নে কয়টি মৌজা আছে এবং ৮নং রেজিস্টারের ১নং খতিয়ানে রাস্তা এবং বরাদ্দকৃত জমি বাদ দিয়ে বর্তমানে খাতামধুপুর ইউনিয়নে কোন মৌজায় কতগুলো খাস জমি আছে সেগুলোর রেকর্ডের কপি সংগ্রহ করা।

মিঠুনদাস ১৭/০৭/২০১১ তারিখে ডাকযোগে সহকারী কমিশনার (ভূমি), সৈয়দপুর, নীলফামারী অফিসে তথ্যপ্রাপ্তির আবেদন করেন। আবেদন পাঠানো তিন দিন পর সহকারী কমিশনার (ভূমি) ফোন করে মিঠুন দাস এর পরিচয় জানতে চান। তারপর তিনি একটু ধমক দিয়ে বলেন, "আপনি কি বেশি আইন জানেন"? এর জবাবে মিঠুন দাস তাঁকে বাংলাদেশ সরকারের ২০০৯ সালে প্রণীত তথ্য অধিকার আইনের বিষয়টি জানিয়ে দেন এবং সে আইনের বলে তথ্য আবেদন করার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে জানিয়ে দেন। এক পর্যায়ে উক্ত কর্মকর্তা মিঠুন দাস'কে মানহানি মামলা করার হুমকি দেন। মিঠুন দাস তখন উক্ত কর্মকর্তাকে সব কিছু মোবাইলে রেকর্ড করার কথা বলেন। এই কথা শুনামাত্র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা সঙ্গে সঙ্গে ফোন বন্ধ করে দেন। আবেদন প্রদানের ২০ কার্যদিবসের দিনে মিঠুন দাস এর নামে সৈয়দপুর উপজেলা ভূমি অফিস থেকে একটি চিঠি পাঠানো হয়। তাতে উল্লেখ করা হয় যে, মিঠুন দাস, আপনাকে আগামী ৫ কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনের উল্লেখিত তথ্য প্রাপ্তির জন্য ৭.০০ টাকা ফি প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলো। তথ্য অধিকার কর্মী মুন্না দাস'কে সাথে নিয়ে ৮ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখ দুপুর ১২:০০ টার সময় মিঠুন দাস সংশ্লিষ্ট ভূমি অফিসে যান । সেখানে কর্মরত এক অফিস সহকারীকে বিয়টি অবগত করেকোথায় টাকা জমা করবেন তা জানতে চান। তিনি তখন তাঁর স্যারের (সহকারী কমিশনার, ভূমি) সাথে কথা বলতে পরামর্শ দেন। সে অনুযায়ী আলাপ করতে গেলে উক্ত কর্মকর্তা দায়সাড়াভাবে বলেন, সেটা আপনি জানেন। তখন একই আইনের বিধিমালায় নির্ধারিত এ-৪ ও এ-৩ মাপের কাগজের ক্ষেত্রে প্রতি পৃষ্ঠা ২ (দুই) টাকা হারে এবং তদূর্ধ্ব সাইজের কাগজের ক্ষেত্রে প্রকৃত মূল্য প্রদানের কথা উল্লেখ থাকার বিষয়টি আমলে আনা হয়। তারপরও তিনি বলেন যে, আপনি কোথায় দিবেন সেটা আপনি জানেন। এভাবে আলোচনার একপর্যায়ে রেভিন্যু স্টাম্পের মাধ্যমে নির্ধারিত মূল্য পরিশোধ করা হয়। সেদিনই আবেদনের যাবতীয় তথ্য ফটোকপি আকারে প্রদান করা হয়েছে।

তথ্য আবেদনের ফলে সরকারী অফিসের লোকজনও এখন ধীরে ধীরে বুঝতে পারছেন যে, এখন থেকে আবেদনকারীদের আর হুমকি বা ধমক দিয়ে কোন ভাবেই থামিয়ে রাখা যাবে না। আইন অনুযায়ী নির্ধারিত তথ্য সরকারী কর্মকর্তাদের প্রদান করা এখন বাধ্যতামূলক। অন্যদিকে একটু একটু করে হলেও সমাজের লোকজন বুঝতে পারছেন যে, এই আইনের কারণে বাস্তবে তাঁরা এখন অনেক ক্ষমতার অধিকারী হয়েছেন।

১২. শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম ও দূর্নীতি হ্রাস

পার্বত্য জেলা পরিষদে শিক্ষক নিয়োগে দীর্ঘদিন ধরে অনিয়ম চলে আসছিল। জনশ্রুতি আছে যে, প্রত্যেক শিক্ষক নিয়োগে ৪/৫ লক্ষ টাকা ঘুষ নেয়া হয়। লোকজনও এই অনিয়ম বা দূর্নীতিকে মেনে নিয়েছে। এরূপ দুর্নীতিরোধ কল্পে তথ্য কর্মী রিপন চাকমা স্ব-উদ্যোগে ২৯/৮/২০১১ তারিখে পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে তথ্য আবেদন করেন। প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের নীতিমালা এবং ২০১১ সালের জানুয়ারী থেকে জুন পর্যন্ত নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের নাম, নিয়োগ পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর ও পরীক্ষা খাতাসমূহ দেখার জন্য আবেদন করেন তিনি।

বিষয়টির সাথে যেহেতু দুর্নীতি জড়িত ছিল তাই পরিষদ থেকে রিপন চাকমা'কে সমঝোতার প্রস্তাব দেয়া হয়। তিনি প্রস্তাবে রাজী না হলে তারা অসম্পূর্ণ তথ্য প্রদান করেন। অসম্পূর্ণ তথ্য পেয়ে রিপন চাকমা আপীল করতে বাধ্য হন। আপীল কর্মকর্তা অর্থাৎ পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ির চেয়ারম্যান তাকে রেস্ট হাউসে ডেকে নিয়ে ব্যক্তিগতভাবে বিনীত অনুরোধ করেন তথ্য না চাওয়ার জন্য। এতেও কাজ না হলে তিনি এলাকার গণ্যমান্য লোক দিয়ে রিপন চাকমাকে উক্ত কাজ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করা হয়।এক সময় রিপন চাকমা বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পারেন যে, তিনি সমঝোতায় না গেলে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এতে তিনি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে থাকেন।

পরবর্তীতে তাদের চাপ, অনুরোধ, হুমকি ইত্যাদি অব্যাহত থাকলেও রিপন চাকমা ঐসব তোয়াক্কা না করাতে তারা তথ্য না দিলেও শিক্ষকদের নাম, প্রাপ্ত নম্বর এবং খাতাসমূহ দেখান। তখন তারা এও স্বীকার করেন যে, শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম হয়েছে। তখন তারা ভবিষ্যতে ঐরকম আর হবে না বলে ব্যাপারটি বাইরে/ জনসম্মুখে প্রচার না করতে রিপন চাকমা'কে কড়জোরে অনুরোধ করেন।

আবেদন করার পর থেকে প্রকাশ্যে দূর্নীতি, অনিয়ম অনেকটা হ্রাস পেয়েছে। পূর্বে এই ধরনের অনিয়মের ব্যাপারটি প্রকাশ্যে ঘটলেও কারোর কিছু করার ছিল না। এই সব দেখে এলাকার লোকজন বলাবলি করতে শুরু করেছে যে, একটা তথ্য আবেদনেই জেলা পরিষদের কর্তাব্যক্তিদের ঘুম হারাম হয়ে গেছে। এটা এলাকার অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট পদে নিয়োগের ক্ষেত্রেও প্রভাব ফেলেছে বলে লোকজনের মুখে মুখে প্রচার হচ্ছে।

রিপন চাকমা'র তথ্য আবেদনের এই ঘটনা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, প্রভাবশালী মানুষদের হুমকি-ধমকি, চাপ, অনুরোধ ইত্যাদি তোয়াক্কা না করে যদি সৎ সাহসের সাথে তথ্য আবেদন করা যায় তবে শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়েগসহ সব ক্ষেত্রে দূর্নীতি ও অনিয়ম ধীরে ধীরে কমে যাবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

১৩. ক্ষুদ্রঋণ দলের সঞ্চিত অর্থ নিয়ে দীর্ঘদিনের অনিয়মজনিত ভোগান্তির অবসান ও দরিদ্র নারী সদস্যদের সঞ্চিত অর্থ লাভের ক্ষেত্রে বিশেষ সম্ভাবনা সৃষ্টি।

ব্র্যাক বাংলাদেশের দরিদ্র জনগণের আর্থিক সচ্ছলতা আনয়নের মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে সমতলের মত পার্বত্য চট্টগ্রামে ১৯৯৭ পরবর্তী সময়ে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা শুরু করে। এর ধারাবাহিকতায় ব্র্যাক যখন খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার মহালছড়িতে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম শুরু করে তখন মনাটেক পাড়াতে দলগঠনের লক্ষ্যে মাঠকর্মীরা সভা করতে যান।

তখন উক্ত কমীদের কথায় আশ্বস্ত হয়ে তারা নিজেরা উদ্যোগী হয়ে ব্র্যাক কর্মীর কাছে দলগঠনের প্রস্তাব করেন। সে অনুযায়ী মনাটেক পাড়ায় বেশ কয়েকটি ক্ষুদ্র দল গঠন করা হয়। এরপর দলের সদস্যরা ব্র্যাক কর্মীদের পরামর্শমত সঞ্চয় জমাতে থাকেন এবং কেউ কেউ ঋণ প্রস্তাব করেন। পর্যায়ক্রমে সদস্যদের মধ্যে অনেকে ক্ষুদ্রঋণ লাভ করেন এবং নিয়ম অনুযায়ী সেগুলো পরিশোধ করতে থাকেন। এভাবে কার্যক্রম পরিচালনার একপর্যায়ে অর্থাৎ ২০০৭ সালে কোন এক কারণে গ্রামীণ ব্যাংক, আশা ও প্রশিকাসহ এলাকার অনেক ক্ষুদ্রঋণ সংস্থার মত ব্র্যাক তার কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়। এতে ক্ষুদ্রঋণ দলের সিংহভাগ সদস্য নিজেদের নেওয়া ঋণ সম্পূর্ণ পরিশোধ করলেও সঞ্চিত অর্থ লাভে বঞ্চিত হন। সদস্যরা ব্র্যাকের কাছে নিজেদের সঞ্চিত অর্থ লাভের জন্য পরে বহুবার স্থানীয় অফিসে যোগাযোগ করলেও কখনো সদুত্তর পাননি। ব্র্যাক অফিস থেকে প্রতিবারই তাদের মৌখিকভাবে জানানো হয়েছে যে, সঞ্চিত অর্থ কবে ফেরত দেওয়া হবে তা পরবর্তীতে জানানো হবে। এভাবে দিনের পর মাস যায়, বছর যায়, অথচ কবে নাগাদ তাদের সঞ্চিত অর্থ ফেরত দেওয়া হবে তা সুনিদিষ্টভাবে জানানো হয় না। আবার কখনো কখনো তাদের বলা হয় যে, যারা ঋণ নিয়েছে তারা ফেরত দিলে অথবা সদস্যরা মিলে ঐ ঋণ পরিশোধ করে দিলে তবে তাদের অবশিষ্ট সঞ্চিত অর্থ ফেরত দেওয়া হবে। নতুবা কোন অর্থ ফেরত দেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। ব্র্যাক কর্মীদের এমন আচরণে হতাশ হয়ে এক পর্যায়ে ক্ষুদ্রঋণ দলের সদস্যদের সবাই নিজেদের সঞ্চিত অর্থ ফেরত পাওয়ার বিষয়ে এক প্রকার হাল ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। ২০১১ সালে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে রিইব কর্মীদের কাছে বিশেষভাবে জানার পর স্থানীয় সংগঠন "পাড়া- ট্রাস্ট" কর্মী প্রদীপ শশী চাকমা বিষয়টি কেন এভাবে চলতে থাকবে তা বিস্তারিত জানার জন্য তথ্য আবেদন করেন।

তার তথ্য আবেদনের বিষয় ছিলঃ

১. ব্র্যাক এর ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনার নীতিমালার ফটোকপি পেতে চাওয়া।
২. ব্র্যাক পার্বত্য চট্টগ্রাম সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচী- সঞ্চয় ও ঋণ পাশ বই ও বীমা খাত- ব্র্যাক এলাকাঃ মহালছড়ি, গ্রাম সংগঠনের নামঃ মনাটেক, গ্রাম সংগঠনের নম্বর ২১২৭, ক্ষুদ্র দল নং- ০২ এর আওতাভূক্ত সদস্যদের ঋণ ও সঞ্চয় কার্যক্রমের যাবতীয় তথ্যের কপি।
৩. কোন সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সদস্যদের সঞ্চয় আটকে রাখা হয়েছে উক্ত সিদ্ধএন্তর কপি পেতে চাওয়া।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারার ভিত্তিতে আবেদনকারী প্রদীপ শশী চাকমা উল্লেখিত বিষয়ের তথ্য লাভের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (শুভাশীষ চাকমা, ম্যানেজার), ব্র্যাক, মহালছড়ি শাখা, খাগড়াছড়িতে গত ২৬ অক্টোবর ২০১১ তারিখে আবেদন করেন। এরপর আইন অনুযায়ী তথ্য লাভের জন্য তিনি অপেক্ষা করতে থাকেন। কিছুদিন পর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ফোনে যোগাযোগ করে কেন তথ্য জানতে চাওয়া হয়েছে তা জেনে নেন। আলোচনার এক পর্যায়ে তিনি উল্লেখিত বিষয়ে কোন তথ্য তাদের কাছে নেই বলে প্রদীপ শশী চাকমাকে মৌখিকভাবে জানিয়ে দেন। তখন তিনি আরও জানান, আবেদনের বিষয়ে কম্পিউটারের ফাইলে কোন তথ্য নেই। সব তথ্য হয়তো মুছে গেছে। যখন এ ঘটনা ঘটে, তখন তিনি এই অফিসের দায়িত্বে ছিলেন না। অন্যলোক দায়িত্বে ছিল। এখন সেই লোক অন্যত্র বদলি হয়ে গেছে। তাই তার পক্ষে এই তথ্য খুঁজে পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না বলে জানান এবং সে কারণে তথ্য প্রদান করাও সম্ভব নয় বলে জানিয়ে দেন। তখন প্রদীপ শশী চাকমা তথ্য না থাকলে তা লিখিতভাবে জানাতে অনুরোধ করেন। অন্যথায় তিনি আপীল করবেন বলে তাকে

জানিয়ে দেন। কিছুদিন অপেক্ষা করার পর তিনি আইন অনুযায়ী ব্র্যাক এর সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আপীল করেন। তার প্রেক্ষিতে তাকে একটি উকিল নোটিশ পাঠানো হয়। সেই নোটিশ পড়ে তিনি তথ্য প্রদান না করার বিষয়টি অবগত হন। এতে প্রদীপ শশী চাকমা সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। তাই গত ২১ জানুয়ারী ২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ করেন।

তথ্য কমিশন বিষয়টি আমলে নিয়ে গত ০৪ এপ্রিল ২০১২ তারিখে শুনানির দিন ধার্য্য করে উভয় পক্ষকে সমন জারি করে। কমিশনের কাছ থেকে সমন পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য আবেদনের বিষয়টি নিয়ে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে সেটি বোঝাপাড়ার মাধ্যমে মিটিয়ে ফেলার জন্য প্রদীপ শশী চাকমাকে অনুরোধ করতে থাকেন। এক পর্যায়ে তার বাড়িতে গিয়ে ক্ষমা চান। তখন প্রদীপ শশী চাকমা তথ্য প্রদান স্বাপেক্ষে উক্ত প্রস্তাবে সম্মত হন এবং তথ্য কমিশনের শুনানিতে ব্র্যাক এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে যাতে কোনভাবেই নাজেহাল বা বিরূপ পরিস্থিতিতে পড়তে না হয় তেমন বক্তব্য উপস্থাপনের আশ্বাস দেন। সে অনুযায়ী প্রদীপ শশী চাকমা তথ্য কমিশনে নিজের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। এতে কমিশনের আদালত সন্তুষ্ট হয় এবং কোন জরিমানা না করে অভিযোগ নিস্পত্তির নির্দেশনা দেয়। উল্লেখ্য যে, সমঝোতার সময় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ব্র্যাক মহালছড়ি শাখার ম্যানেজার হিসেবে সংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্রঋণ দলের সদস্যদের যাবতীয় সঞ্চয় ফেরত প্রদানের বিষয়ে মৌখিক সম্মতি জ্ঞাপন করেন। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, ক্ষুদ্রঋণ দলের ৫ জন সদস্যদের সঞ্চিত অর্থবাবদ সর্বমোট ১০৫৭৯ টাকা সঞ্চয় দীর্ঘদিন যাবৎ অবৈধভাবে আটকে রাখা হয়েছে। অধিকন্তু, একই সংগঠনের আওতায় অপর আরো ২ টি সহ মোট ৩টি ক্ষুদ্র দল আছে যেগুলোর মোট সদস্য সংখ্যা ১৫ জন। এই সদস্যদের পাশ বইয়ের রেকর্ড অনুযায়ী হিসাব করে দেখা গেছে উক্ত সদস্যদের (১ টি সংগঠনের ৩টি ক্ষুদ্র দল) আনুমানিক সঞ্চয় প্রায় ৪৫০০০ টাকারও বেশি।

তথ্য কমিশনের শুনানিতে অভিযোগ নিস্পত্তির পরবর্তীতে উক্ত ক্ষুদ্রঋণ দলের সদস্যরা নিজেদের সঞ্চিত অর্থ ফেরত পাওয়ার বিষয়ে ব্র্যাক মহালছড়ি অফিসে নিয়ম অনুযায়ী আবেদন জমা দেন। ম্যানেজার সদস্যদের আবেদন গ্রহণ করলেও সঞ্চয় প্রদানের ব্যাপারে আবারো আগের মত নানা টালবাহানা করতে থাকেন। এক পর্যায়ে এক মাসের মধ্যে সমুদয় অর্থ প্রদান করবেন বলে জানান। এই বিষয়টি এলাকায় অনেকের মধ্যে জানাজানি হলে অন্যান্য দলের সদস্যরাও একইভাবে তাদের সঞ্চিত অর্থ ফেরত পাওয়ার ব্যাপারে ব্র্যাক অফিসে যোগাযোগ করতে শুরু করেছেন। এতে কাজ না হলে তারা তথ্য আবেদন করবেন বলে জানান। এদের মধ্যে ইতিমধ্যে ২ জন সদস্য একইভাবে তথ্য আবেদন করেছেন। ভূক্তভোগীদের অনেকে মনে করছেন, প্রদীপ শশী চাকমা'র তথ্য আবেদনের ফলে তাদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কামানো টাকা/সঞ্চিত অর্থ নিয়ে এনজিও সমূহ যে দীর্ঘদিনের ভোগান্তি করে চলেছে তা চিরতরে অবসান হতে চলেছে এবং দরিদ্র নারীদের সঞ্চিত অর্থ লাভের ক্ষেত্রে বিশেষ সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। যেহেতু, সঞ্চিত অর্থ এভাবে আটকে রাখার কোন সিদ্ধান্ত নেই বলে ব্র্যাক কর্তৃপক্ষ তাদের লিখিতভাবে জানাতে বাধ্য হয়েছে। তাই তাদের আর সঞ্চয় আটকে রাখার কোন সুযোগ নেই। কারণ এর ব্যত্যয় ঘটলে সদস্যদের এখন আইনের আশ্রয় নেওয়ারও মোক্ষম সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। কারণ যে তথ্য পাওয়া গেছে সেগুলো মামলা পরিচালনার প্রমাণ হিসেবে কাজ করবে। এরপর হতে এলাকায় জনগণ তথ্য অধিকার

আইনের গুরুত্ব অনুধাবন করতে সক্ষম হচ্ছেন এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ স্থানীয় সরকারী ও এনজিও অফিসে তথ্য আবেদন করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

১৪. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জনতা ব্যাংক শাখায় সেবা প্রদানে কর্মকর্তাদের গাফিলতির কারণে ছাত্রছাত্রীদের হয়রানির অবসান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি জনতা ব্যাংক শাখার 'লাঞ্চ টাইম' এ অতিরিক্ত সময় ব্যয় এবং বিভিন্ন কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে গাফিলতি ও অনিয়মের কারণে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিনিয়ত ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছিল। সমস্যাটি প্রতিকারের জন্য সংশ্লিষ্টদের দায়িত্বপালনের নিয়মাবলীর সঠিক তথ্য জানার লক্ষ্যে গণগবেষণা দলের সভায় তথ্য আবেদন করার বিষয়টি নির্ধারিত হয়। তার প্রেক্ষিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়ের শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যায়ন বিভাগের ছাত্র মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে তথ্য পাওয়ার জন্য গত ১ জুন ২০১১ তারিখে আবেদন করেন।

তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্র গ্রহণের নির্ধারিত ২০ কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনকারীকে তথ্য সরবরাহ করবার বিধান আছে। সে অনুযায়ী অপেক্ষা করেও কোন তথ্য না পাওয়ার কারণে সরাসরি ব্যাংক ম্যানেজারের সাথে বিষয়টি নিয়ে মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম দলের কয়েকজনকে সাথে নিয়ে আলোচনা করতে যান। এপ্রেক্ষিতে তাঁকে হেড অফিস এই তথ্য প্রদান করবে বলে সেদিন জানানো হয়। কিন্তু নির্ধারিত ৩০ কার্যদিবসের মধ্যেও তথ্য না পাওয়ার কারণে গত ১৪ জুলাই ২০১১ তারিখে তিনি আইন অনুযায়ী উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আপীল করেন। সেখান থেকে আইন অনুযায়ী পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে কোন জবাব না পাওয়ার কারণে তিনি গত ৮ আগস্ট ২০১১ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন। তথ্য কমিশনে অভিযোগ করার কয়েকদিন পর সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অনেকটা দায় এড়িয়ে যাওয়ার জন্য মিথ্যা তথ্য প্রদান করেন। বিষয়টি নিয়ে সন্তুষ্ট না হওয়ায় তথ্য কমিশন অভিযোগ আমলে নিয়ে গত ৩০ অক্টোবর ২০১১ তারিখে শুনানির জন্য সমন জারি করলে তিনি সেখানে উপস্থিত হন। সে অনুযায়ী উভয় পক্ষ শুনানিতে অংশগ্রহণ করে নিজ বক্তব্য উপস্থাপন করে। তথ্য কমিশনারগণ বিষয়গুলো আমলে নিয়ে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কে আবেদনকৃত তথ্যসহ ২১ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে পরবর্তী শুনানিতে উপস্থিত থাকার নির্দেশনা প্রদান করে। উক্ত শুনানিতে আবারো সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে কমিশনারগণ তথ্য প্রদানের নির্দেশনা প্রদান করলে তিনি আবেদনকারীকে তথ্য প্রদান করেন।

তথ্য প্রদানে বাধ্য হওয়ার পর থেকে জনতা ব্যাংকের সকল শাখায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি জনতা ব্যাংক শাখায় কর্মকর্তাদের সেবা প্রদানের মানও এখন আগের যথেষ্ট উন্নত হয়েছে।

১৫. কৃষকদের সারের বারতি দাম ফেরত পাওয়া

২৬/৮/২০১২ তারিখে ভূমিবন্দর উপজেলার হাসিমপুর গ্রামে কৃষক ও ক্ষেতমজুর সমিতির উদ্যোগে এক হাট সভা হয়। উক্ত সভায় কৃষকদের সাথে মতবিনিময় হয়। এতে অন্যদের সাথে তথ্য কর্মী কামরুন নাহার ইরা অংশগ্রহণ করেন। সেখানে আলোচনার এক পর্যায়ে তিনি কৃষকদের তথ্য অধিকার আইনের উপর ধারণা দেন। তার কাছে কৃষকরা তথ্য অধিকার আইনের কথা শুনে ইউএনওর কাছে আবেদন করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। কারণটা হল- গত ২২/৮/২০২

তারিখে বাজারে বস্তা প্রতি সারের দাম ছিল ১০২৫ টাকা। আর রাতে বৃষ্টি হওয়ার দরুন পরের দিন তা বৃদ্ধি পেয়ে ১১০০ টাকা ধার্য্য করা হয়। এতে স্থানীয় কৃষকদের মাঝে মাথায় হাত উঠে। এ নিয়ে তাদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। তাই দেশে এই আইন হওয়ার বিষয়টি জানতে পেরে তখন অনেকে এর কারণ জানার জন্য তথ্য আবেদন করা দরকার বলে মত প্রকাশ করেন। তখন কৃষকদের মধ্যে সাহেদ আলী, নজির উদ্দিন, খালেক মিয়া ও সানাউল হক আবেদন করবেন বলে জানান। তার পরিপ্রেক্ষিতে ইকবাল ও সবুজ নামের দুই ইউনির্ভাসিটি ছাত্র তাদের তথ্য আবেদনপত্র লিখতে সহায়তা করেন যা পরের দিন ইউএনও অফিসে জমা দেন। আবেদনের পাওয়ার পরে ইউএনও আবেদনকারীদের ডেকে পাঠান। তারপরে যারা বেশি দামে সার কেনার রসিদ দেখাতে পেরেছেন তাদের বারতি টাকা সার বিক্রেতাদের কাছ থেকে আদার করে দেন।

১৬. পূর্বে যারা অফিসে যেতে পারত না তাদের কাছ থেকে এখন কর্মকর্তারা শিখছে

দিনাজপুর জেলার, চিরিরবন্দর উপজেলার, ৩ নং ফতেজংপুর ইউনিয়নে, ৪ নং ওর্য়াডে কতজন বয়স্ক ভাতা পায় তাদের নামের তালিকা এবং কোন কোন তারিখে তারা কি পরিমান অর্থ/ভাতা পেয়েছে তার বিবরণ চেয়ে তথ্য আবেদন করেন সুকুমার দাস।

সুকুমার দাস ২০/০৯/২০১১ তারিখে তথ্য আবেদন পাঠালে তার কিছুদিন পর স্থানীয় ওর্য়াড মেম্বার চৌকিদারকে দিয়ে তাকে খবর পাঠান। চৌকিদার এসে তাকে মেম্বারের সাথে দেখা করতে যাওয়ার কথা জানিয়ে দেয়। তখন সুকুমার দাস দেখা না করতে পারায় তথ্য গ্রহণকারী হিসেবে আবেদনে প্রদত্ত তথ্য অধিকার কর্মী মুন্না দাসকে তিনি ০৩/১০/২০১১ তারিখে ফোন করেন। সে সময় মেম্বার মুন্না দাসকে সুকুমার দাস এর তথ্য আবেদনের বিষয়টি জানান। তালিকাগুলোর নাম স্পষ্ঠ বোঝা যাচ্ছে না তাই কিভাবে সেগুলো পাঠাবেন তার ব্যাপারে মুন্না দাস এর মতামত জানতে চান। এরপর ০৫/১০/২০১১ তারিখে চিরির বন্দর উপজেলা সমাজসেবা অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিজের পরিচয় দিয়ে মোবাইল ফোনে মুন্না দাসকে বলেন, 'আপনি অফিসে এসে সুকুমার দাসের তথ্য আবেদনের জবাব কিভাবে তৈরী করবো তা বুঝিয়ে দিলে আমার জবাব দিতে সুবিধা হয়'। মুন্না দাস ৯ অক্টোবর ২০১১ তারিখে সমাজসেবা অফিসে গিয়ে আবেদনের বিষয়টি বুঝিয়ে দেন। তখন সমাজসেবা অফিসার মুন্না দাসকে বলেন, দাদা, আপনি বুঝিয়ে না দিলে তথ্য প্রদানের নিয়ম-কানুন আমার অজানাই থেকে যেতো। এখন আপনার তথ্য তৈরী করে দিতে পারবো। পরবর্তীতে চিঠির মাধ্যমে ডাকযোগে তথ্য আবেদনের জবাব পাঠানো হয়।

সমাজের লোকজন এখন বুঝতে পারছে যে, আগে যেখানে তাদের অফিসে ঢুকতে দিত না এখন সেখানে চিঠি দিয়ে আবেদনের জবাব পাঠিয়ে দিচ্ছে। অন্যদিকে এই তথ্য আবেদনের মাধ্যমে সরকারি কর্মকর্তারাও এ ব্যাপারে সচেতন হচ্ছে। তারা আইনটি সর্ম্পকে জানছে এবং তাদের দায়িত্ব পালনে আরো বেশি মনযোগী হচ্ছে।

সরকারি অফিসের অনেক কর্মকর্তা এখনো তথ্য অধিকার আইন সর্ম্পকে জানেন না। তাদের এই আইন সর্ম্পকে জানানো দরকার। উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিলে তারা জনগণের তথ্য অধিকার প্রদানে দক্ষতা ও আগ্রহ তৈরী হবে। অপরদিকে

বাংলাদেশের অনেক বয়স্ক লোক এখনো ভাতা পায় না। এক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারের মাধ্যমে তারা তাদের ন্যায্য অধিকার পেতে পারে।

১৭. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে তথ্য প্রাপ্তি:

মো: শামীন হোসেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্ড়ি ও সংর্ঘষ অধ্যয়ন বিভগের তৃতীয় বর্ষের একজন ছাত্র। শান্ড়ি ও সংর্ঘষ অধ্যয়ন বিভগের ছাত্র হওয়ার সুবাদে তার একাডেমিক এসাইনমেন্ট এর অংশ হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রীর রাষ্ট্রীয় কাজে বিদেশ ভ্রমন বিষয়ে কিছু তথ্য প্রয়োজন পড়ে। তাই তিনি গত ১৯ মার্চ ২০১২ তারিখে ২০০৯ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ড় পররাষ্ট্র মন্ত্রীর রাষ্ট্রীয় কাজে বিদেশ ভ্রমন প্রসঙ্গে নিম্নক্ত বিষয় সম্পর্কে জানতে তথ্য চেয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সৈয়দ মাসুদ মাহমুদ খোন্দকার, মহাপরিচালক (বহি:পচার অনুবিভাগ) এর নিকট "তথ্য অধিকার আইন ২০০৯" এর ৮(১) ধারার ভিত্তিতে ডাকযোগে একটি আবেদন করেন। ১) গত ২০০৯-১১ সাল পর্যন্ড় পররাষ্ট্র মন্ত্রী বিদেশে ভ্রমন এর জন্য সরকারি কোষাগার থেকে যে পরিমান অর্থ ব্যয় হয়েছে তার তথ্য এবং ২) ২০০৯-১১ সাল পর্যন্ড় পররাষ্ট্র মন্ত্রী রাষ্ট্রীয় কাজে কতবার বিদেশে ভ্রমন করেছে তার সংখ্যা, তারিখ ও উদ্দেশ্য জানতে চেয়ে আবেদন করা হয়। আবেদন পত্র পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পৌছালে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শামীনকে ফোন দিয়ে জানতে চান যে তিনি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আবেদনকারী মো: শামীন হোসেন কি না এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র কি না। উত্তরে শামীন ঐ কর্মকর্তাকে আবেদনকারী হিসেবে নিজেকে পরিচয় দেন এবং তিনি যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে একজন ছাত্র সে বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তারপর আইন অনুযায়ী ২০ কার্যদিবস অপেক্ষা করে তথ্য না পেলে পরে অতিরিক্ত আরও ১০ কার্যদিবস পর্যন্ড় অপেক্ষা করেন। উক্ত সময়ের মধ্যে তথ্য না পেলে গত ১৭ মে, ২০১২ তারিখে আপীল কর্মকর্তা মো: মিজারুল কায়েস, পররাষ্ট্র সচিব এর নিকট আপীল করেন। আইন অনুযায়ী পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে তথ্য দেওয়ার কথা থাকলেও উক্ত সময়ের মধ্যে কোন প্রকার তথ্য দেওয়া হয়নি। ফলে গত ১২ জুন, ২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ করতে বাধ্য হন শামীন। এমতাবস্থায়, গত ০৩ জুলাই ২০১২ তারিখে লিখিত আকারে আবেদনকৃত তথ্যের একটি কপি ডাকযোগে এসে পৌছায়। তথ্য পাওয়ার কিছু দিন পর (২৫ জুলাই ২০১২ তারিখে) তথ্য কমিশন থেকে ফোন করে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে তিনি তথ্য পেয়েছেন কি না তা জানতে চাওয়া হয়। তখন তিনি তথ্য পাওয়ার কথা তাকে জানিয়ে দেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত তথ্যগুলো শামীন সহপাঠীদের জানিয়েছেন। এই ঘটনা জানার পর তাদের অনেকে তথ্য আবেদন করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। তাদের মধ্যে ২ জন সহপাঠী দূর্নীতি দমন কমিশনে তথ্য আবেদন পাঠিয়েছেন।